সূচিপত্র

১. কার্জন হল ২
২. আহসান মঞ্জিল ৩
৩. ঢাকা ক্লাব ৪
৪. বাংলা একাডেমী ৫
৫. বায়তুল মুকাররম মসজিদ ৬
৬. মিটফোর্ড হাসপাতাল ৭
৭. জাতীয় স্মৃতিসৌধ ৮
৮. বলধা গার্ডেন ৯
৯. বাহাদুর শাহ পার্ক ১০
১০. ঢাকা কলেজ ১১
১১. বড় কাটরা, ঢাকা ১২
১২. ঢাকা চিড়িয়াখানা ১৩
১৩. জাতীয় সংসদ ভবন ১৪
১৪. হোসেনী দালান ১৫
১৫. জিনজিরা প্রাসাদ ১৬
১৬. জগন্নাথ কলেজ ১৭
১৭. পানাম নগর ১৮
১৮. সোনারগাঁও ১৯
১৯. রমনা রেসকোর্স ২০
২০. বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ ২১
২১. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ ২২

কার্জন হল

প্রচার তারিখ : ০১/১০/২০১৮ খ্রিঃ
প্র সময় :
উপস্থাপনা :

সুপ্রভাত ঢাকার ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পর্বে আজকের বিষয়: কার্জন হল

ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জনের নামানুসারে **কার্জন হল** ভবনটি টাউন হল হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরের বছরই বাংলাকে বিভক্ত করা হয় এবং ঢাকা হয় নতুন প্রদেশ পূর্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানী।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে এটি ঢাকা কলেজ ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। পরে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এ ভবন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে এবং এখনও এভাবেই চলছে।

অত্যন্ত যত্নসহকারে গড়ে তোলা প্রশস্ত বাগানে নির্মিত ইটের এ দ্বিতল ভবনে রয়েছে একটি বিশাল কেন্দ্রীয় হল। সে সাথে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পার্শ্বে রয়েছে সংযোজিত কাঠামো যা অসংখ্য কক্ষ সমৃদ্ধ এবং চারপাশ দিয়ে বারান্দা ঘেরা।

ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য হিসেবে বিবেচিত এ ভবনটিতে সংযোজিত হয়েছে ইউরোপ ও মুগল স্থাপত্য রীতির দৃষ্টিনন্দন সংমিশ্রণ। লাল রঙ ব্যবহৃত হয়েছে মুগল আমলের লাল বেলেপাথরের পরিবর্তে; আর অলংকৃত বন্ধনী, গম্বুজ বিশিষ্ট প্যাভিলিয়ন ১৫৭০ থেকে ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট আকবরের রাজধানী প্রাসাদ সমৃদ্ধ নগরদুর্গ ফতেহপুর সিক্রির সুপরিচিত দীউয়ান-ই-খাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় ইচ্ছাকৃতভাবে ফতেহপুর সিক্রি রীতি গ্রহণের পেছনে কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, ব্রিটিশরা আকবরকেই সবচেয়ে বিজ্ঞ ও সর্বাধিক সহিষ্ণু মুগল সম্রাট হিসেবে গণ্য করত এবং তারা দেখাতে চাইত যে ভারতে তাদেরও ভূমিকা অনুরূপ।

ভাষা আন্দোলন এর ইতিহাসে কার্জন হল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ১৯৪৮ সালে এখানেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তদানীন্তন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু এতদসংক্রান্ত জিন্নাহর ঘোষণার প্রতি প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

আহসান মঞ্জিল

প্রচার তারিখ : ০২/১০/২০১৮ খ্রিঃ
প্র সময় :
উপস্থাপনা :

সুপ্রভাত ঢাকা প্রভাতী অনুষ্ঠানের ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পর্বে আজকের বিষয়: আহসান মঞ্জিল

আহসান মঞ্জিল বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে কুমারটুলি এলাকায় ঢাকার নওয়াবদের আবাসিক প্রাসাদ ও জমিদারির সদর কাচারি। বর্তমানে জাদুঘর। কথিত আছে, মুগল আমলে এখানে জামালপুর পরগনার জমিদার শেখ এনায়েতউল্লাহর রঙমহল ছিল। পরে তাঁর পুত্র মতিউল্লাহর নিকট থেকে রঙমহলটি ফরাসিরা ক্রয় করে এখানে একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে।

১৮৩০ সালে খাজা আলীমুল্লাহ ফরাসিদের নিকট থেকে কুঠিবাড়িটি কিনে নেন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করে এটি নিজের বাসভবনে পরিণত করেন। খাজা আব্দুল গনি ১৮৫৯ সালে আহসান মঞ্জিলের পুনঃনির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং ১৮৭২ সালে নির্মান কাজ সমাপ্ত হয়। আবদুল গনি তাঁর পুত্র খাজা আহসানুল্লাহ-র নামানুসারে ভবন এর নামকরণ করেন আহসান মঞ্জিল।

১৮৮৮ সালে ৭ এপ্রিলে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে আহসান মঞ্জিলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয় বিশেষ করে অন্দরমহলটি একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। নওয়াব আহসানুল্লাহ অন্দরমহলটি পুনর্নির্মাণ করান। বর্তমানে ভবনটিতে যে সুদৃশ্য গম্বুজ রয়েছে তা এ সময় সংযোজন করা হয়। আহসান মঞ্জিলের মূল গম্বুজটির ভূমি থেকে শীর্ষের উচ্চতা প্রায় ২৭ মিটার। প্রাসাদটির দক্ষিণ দিকের দোতলার বারান্দা থেকে একটি সুবৃহৎ খোলা সিঁড়ি সম্মুখস্থ বাগান দিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত নেমে গেছে।

আহসান মঞ্জিল এমন একটি স্থাপত্য যার সঙ্গে বাংলার ইতিহাসের বেশ কিছু অধ্যায় জড়িত। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে পাকিস্তানের প্রথম পর্ব পর্যন্ত প্রায় একশ বছর ধরে এ ভবন থেকেই পূর্ব বাংলার মুসলমানদের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ ভারতের যেসব ভাইসরয়, গভর্নর ও লে. গভর্নর ঢাকায় এসেছেন, তাঁদের প্রায় সবাই এখানে আগমন করেছেন। বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনার প্রতি জনসমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ সফরে এসে এ প্রাসাদে অবস্থান করেন। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সূতিকাগার হিসেবে আহসান মঞ্জিল আজ ইতিহাসের অঙ্গ।

আহসান মঞ্জিলের ঐতিহাসিক ও স্থাপত্যিক গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশ সরকার ভবনটিকে সংস্কার করে জাদুঘরে পরিণত করার উদ্যোগ নেয়। ১৯৮৫ সালে আহসান মঞ্জিল ও সংলগ্ন চত্বর অধিগ্রহণ করা হয়। গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের দায়িত্বে এর সংস্কার কাজ সমাপ্ত হয় ১৯৯২ সালে। ওই বছর ২০ সেপ্টেম্বর থেকে প্রাসাদটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরএর নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং এখানে একটি জাদুঘর স্থাপন করা হয়।

ঢাকা ক্লাব

প্রচার তারিখ : ০৩/১০/২০১৮ খ্রিঃ
প্র সময় :
উপস্থাপনা :

ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পর্বে আজকের বিষয়: **ঢাকা ক্লাব**

প্রিয় শ্রোতা, ঢাকা ক্লাব ঢাকায় অবস্থিত অভিজাত শ্রেণির লোকদের প্রধান সামাজিক সমিতি। শুরুতে এটি ছিল একান্তভাবে শ্বেতাঙ্গ লোকদের বিনোদন ক্লাব। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকাকে নবগঠিত পূর্ববাংলা এবং আসাম প্রদেশের রাজধানী করা হয়। নতুন প্রদেশ শাসনে আগত ইংরেজগণ কলকাতার বেঙ্গল ক্লাবের আদলে ঢাকায় একটি সামাজিক ক্লাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১১ সালের ১৯ আগস্ট ঢাকা ক্লাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ক্লাবটি শাহবাগে অবস্থিত এবং এর আশে পাশে রয়েছে ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়, জাতীয় জাদুঘর, বারডেম হাসপাতাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, রমনা পার্ক এবং সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান।

১৮৮২ সালের ভারতীয় কোম্পানি আইনের অধীনে ১৯১১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ক্লাবটিকে আইনি মর্যাদা প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠার পরপরই ক্লাবটি বর্ণগতভাবে একটি মিশ্রক্লাবে পরিণত হয়, যদিও ১৯৪৭ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গদের আধিপত্য বজায় থাকে। ক্লাবটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন লে. কর্নেল ই.এ হল (সিভিল সার্জন, ঢাকা), সি.আর ব্রায়ান, এইচ. জি বেলি (কমান্ড্যান্ট, মিলিটারি পুলিশ ব্যাটেলিয়ান, ঢাকা), জে.ও রেনি (পিডব্লিউডি, ঢাকা) এবং ঢাকাস্থ ভারতীয় পুলিশ বাহিনীর জে.এস উইলসন ও এ.টি হ্যালিডে।

প্রতিষ্ঠাকালে ঢাকা নবাব এস্টেট থেকে ক্লাবের জমি বন্দোবস্ত নেওয়া হয়েছিল। ১৯৪১ সালে বাংলার গভর্নর ৫২৪ বিঘা পরিমাণ জমি ঢাকা ক্লাবকে বন্দোবস্ত দেন। এ জমির (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের অধিকাংশ) একটি ঘোড় দৌড়ের মাঠ, গলফ খেলার মাঠ, ক্লাবের কিছু ভবন ও খেলার মাঠের কাজে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ক্লাবটির নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে আছে ৫ একর পরিমাণ জমি। এ জায়গাটুকুতে সভাকক্ষ, সেমিনার কক্ষ, হল ঘর, অতিথি কক্ষ, খাবার ঘর এবং টেবিল টেনিস, বিলিয়ার্ড, স্কোয়াশ, সাঁতার, লন টেনিস ইত্যাদি খেলার সুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে।

কাল পরিক্রমায় ক্লাবটির সদস্য সংখ্যা, ভৌত সুবিধাদি ও সেবা কার্যক্রম যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছে। এটি এখন সকল পেশার অভিজাত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মিলনস্থলে পরিণত হয়েছে। অতীতে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাঙ্গন খেলাধুলাই ক্লাবটির প্রধান চিত্র ছিল বর্তমানে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকেও যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

বাংলা একাডেমী

প্রচার তারিখ : ০৪/১০/২০১৮ খ্রিঃ
প্র সময় :
উপস্থাপনা :

ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পর্বে আজকের বিষয়: বাংলা একাডেমী

প্রিয় শ্রোতা, **বাংলা একাডেমী** বাংলা ভাষা সংক্রান্ত সর্ববৃহৎ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৩৬২ বঙ্গাব্দের ১৭ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫) ঢাকার বর্ধমান হাউসে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং এ দেশের মুসলিম মধ্যবিত্তের জাগরণ ও আত্মপরিচয় বিকাশের প্রেরণায় এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়।

বিশ শতকের প্রথমদিকে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ সূচিত হয়। অখন্ড বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তারা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর। এ অবস্থা অতিক্রম করার প্রয়াসে লেখক-পন্ডিত-গবেষকদের দৃষ্টি পড়ে বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি। ১৯২৫ সালে কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষায় জ্ঞান সাধনা ও সাহিত্য চর্চার প্রস্তাব করেন। ১৯৪০ সালে এ.কে ফজলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্সে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা সরকারকে একটি অনুবাদ বিভাগ স্থাপনের অনুরোধ করেন। বিভাগোত্তর কালে ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকায় পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির অভিভাষণে শহীদুল্লাহ্ একটি একাডেমি গড়ার কথা বলেন।

১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। পরের বছর পূর্ববাংলা আইনসভার নির্বাচনে বিজয়ী যুক্তফ্রন্ট পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করে, কিন্তু অল্পদিনেই তাদের পতন হওয়ায় সে প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়বার যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমীর উদ্বোধন করেন। এভাবে বাংলা ভাষার মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাস্তব রূপ লাভ করে। একাডেমী সূচনায় ছিল একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৭ সালে 'দি বেঙ্গলী একাডেমী অ্যাক্ট' গৃহীত হলে এটি সরকারি অর্থে পরিচালিত স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই দেশবাসীর দৃষ্টিতে বাংলা একাডেমী একটি মার্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। শুধু বাংলা ভাষার অধিকার আদায়ের সংগ্রামের আবেগময় ভাবাদর্শের প্রতীকরূপেই নয়, বিশ্বের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসিদ্ধ কেন্দ্রগুলির অন্যতম প্রতিষ্ঠানরূপেও এটি পরিগণিত হয়ে থাকে। একে এখন বাঙালির মননের প্রতীক বলে মনে করা হয়।

সূত্র: বাংলাপিডিয়া

বায়তুল মুকাররম মসজিদ

প্রচার তারিখ : ০৫/১০/২০১৮ খ্রিঃ
প্র সময় :
উপস্থাপনা :

ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পর্বে আজকের বিষয়: বায়তুল মুকাররম মসজিদ

প্রিয় শ্রোতা, **বায়তুল মুকাররম মসজিদ** বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ। ১৯৬০ সালের ২৭ জানুয়ারি এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। তবে কয়েকটি পর্যায়মিলে এর নির্মাণ কাজের কিছু অংশ এখনো অব্যাহত রয়েছে। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক থেকে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ঢাকা নগরীর বিস্তৃতি ঘটছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আব্দুল লতিফ ইবরাহিম বাওয়ানি প্রথম ঢাকাতে বিপুল ধারণক্ষমতাসহ একটি গ্র্যান্ড মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেন। ১৯৫৯ সালে 'বায়তুল মুকাররম মসজিদ সোসাইটি' গঠনের মাধ্যমে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গৃহীত হয়। পুরাতন ঢাকা ও নতুন ঢাকার মিলনস্থলে মসজিদটির জন্য জায়গা অধিগ্রহণ করা হয়। স্থানটি নগরীর প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র থেকেও ছিল নিকটবর্তী। স্থপতি টি. আব্দুল হুসেন থারিয়ানিকে মসজিদ কমপ্লেক্সটির নকশা প্রণয়নের জন্য নিযুক্ত করা হয়। পুরো কমপ্লেক্স নকশার মধ্যে দোকান, অফিস, লাইব্রেরি ও গাড়ি পার্কিং-এর ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রধান ভবনটিতে সাদা রং-এর ব্যবহার, প্রায় 'কিউবিক' আকৃতির অবকাঠামোসহ সমগ্র নকশাটিতে নির্মাণ সময়ের স্থাপত্যিক প্রভাব প্রতিফলিত হয়। মসজিদটির প্রধান কক্ষের ছাদের উপর গম্বুজের অনুপস্থিতি মসজিদ স্থাপত্যের একটি বিরল বৈশিষ্ট্য। প্রধান ভবনটি আট তলা এবং মাটি থেকে প্রায় ৩০ মিটার উঁচু। মূল নকশা অনুযায়ী মসজিদের প্রধান প্রবেশপথ পূর্ব দিকে এবং এর দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্বে উযুর জন্য জায়গা রয়েছে। প্রধান ভবনের উপর গম্বুজের অনুপস্থিতির অভাব ঘোচানো হয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশ বারান্দার উপর দুটি ছোট গম্বুজ নির্মাণের মাধ্যমে।

এই প্রবেশ বারান্দাগুলিতে আবার তিনটি অশ্বখুরাকৃতি খিলানপথ রয়েছে, যার মাঝেরটি পার্শ্ববর্তী দুটি অপেক্ষা বড়। দুটি উন্মুক্ত অঙ্গন, প্রধান নামাজ কক্ষে আলো ও বাতাসের চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তিন দিকে বারান্দা দ্বারা ঘেরা প্রধান নামাজ কক্ষটির আয়তন প্রায় ২৪৬৩ বর্গ মিটার । প্রধান নামাজ কক্ষের মিহরাবটি আয়তাকার। অলংকরণের আধিক্যকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এ কারণে যে, আধুনিক স্থাপত্যে কম অলংকরণই একটি বৈশিষ্ট্য। বায়তুল মুকাররম মসজিদটি স্থাপত্যিক রীতিতে আধুনিক। তবে এটি প্রচলিত মসজিদ স্থাপত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যকে এড়িয়ে যায়নি। এর অবয়ব মক্কার কাবা শরীফের মতো হওয়ার কারণে মুসলমানদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে।

মিটফোর্ড হাসপাতাল

প্রচার তারিখ : ০৭/১০/২০১৮ খ্রিঃ
প্র সময় :
উপস্থাপনা :

ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পর্বে আজকের বিষয়: মিটফোর্ড হাসপাতাল

প্রিয় শ্রোতা, **মিটফোর্ড হাসপাতাল** ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রথম আধুনিক হাসপাতাল। ঢাকার কালেক্টর এবং প্রাদেশিক আপীল বিভাগের জজ স্যার রবার্ট মিটফোর্ডের নামানুসারে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যার মিটফোর্ডের সময়ে মহামারী আকারে ভয়াবহ কলেরা দেখা দেয় এবং ঢাকায় দৈনিক ১৫০ থেকে ২০০ জন মারা যায়। চিকিৎসা সুবিধা ছিল অপর্যাপ্ত। মিটফোর্ড জনগণের এই দুর্দশা দেখে মর্মাহত হন। ১৮৩৬ সালে ইংল্যান্ডে তিনি মৃত্যুর আগে তাঁর সম্পত্তির বেশির ভাগই (প্রায় ৮ লক্ষ টাকা) ঢাকার জনসাধারণের কল্যাণমূলক কাজ এবং একটি হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করার জন্য বাংলার সরকারের নামে উইল করে দেন। এই উইল তাঁর উত্তরাধিকারীদের দ্বারা বিতর্কিত হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৮৫০ সালে প্রধান বিচারালয় বাংলার সরকারের পক্ষে আংশিক রায় দেন। যার সুবাদে এক লক্ষ ছিষট্টি হাজার টাকা পাওয়া যায়। এই অর্থে বর্তমান স্থানে ১৮৫৪ সালে হাসপাতালটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। তখন এই স্থানটি 'কাটরা পাকুড়তলী', বাবুবাজার নামে পরিচিত ছিল। পূর্বে এই জায়গায় ওলন্দাজ কুঠি ছিল। প্রথম থেকেই এই হাসপাতাল পরিচালনার দায়িত্ব ঢাকা পৌরসভার অধীন ছিল।

১৮৮২ সালে ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহ এবং ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের দানে হাসপাতালে একটি মহিলা ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। নবাব আহসানউল্লাহ ১৮৮৮-৮৯ সালে একই দালানের মধ্যে লেডি ডাফরিন হাসপাতাল নির্মাণের জন্য আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন। ১৮৮৭ সালে হাসপাতালে একটি ইউরোপীয়ান ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৮৯-৯০ সালে ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায় তাঁর মায়ের স্মৃতির স্মরণে কিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি চক্ষু বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯১৭ সালে এটি একটি প্রথম শ্রেণীর হাসপাতাল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই হাসপাতালে আলাদাভাবে শিক্ষাদান কক্ষ, শব ব্যবচ্ছেদ কক্ষ এবং একটি রোগী দেখার বহির্বিভাগ ওয়ার্ড সংযোজন করা হয়। এটি ক্রমে একটি জেনারেল হাসপাতালে রূপ লাভ করে, কিন্তু এর আয়তন ও সেবার ধরনে কোন পরিবর্তন হয়নি। নদীর তীরে এটি প্রায় সাড়ে ১২ একর জমির উপর নির্মিত। বর্তমানে এটি বাংলাদেশে অন্যতম প্রধান চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

প্রচার তারিখ : ০৮/১০/২০১৮ খ্রিঃ
প্র সময় :
উপস্থাপনা :

ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পর্বে আজকের বিষয়: জাতীয় স্মৃতিসৌধ

জাতীয় স্মৃতিসৌধ ঢাকা থেকে ৩৫ কিমি উত্তর-পশ্চিমে সাভারে অবস্থিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান শহীদদের অসামান্য ত্যাগ ও শৌর্যের স্মৃতি হিসেবে সৌধটি দাঁড়িয়ে আছে।

১৯৭৮ সালে সৌধ নির্মাণের উদ্দেশ্যে নকশার জন্য একটি জাতীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সাতান্ন জন প্রতিযোগীর মধ্য থেকে স্থপতি মঈনুল হোসেনের নকশাটি নির্বাচিত হয়।

অসমান উচ্চতা ও স্বতন্ত্র ভিত্তির ওপর সাতটি ত্রিভুজাকৃতির প্রাচীর নিয়ে মূল সৌধটি গঠিত। সর্বোচ্চ স্তম্ভটি সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্যের ভিত্তির ওপর, আর সবদীর্ঘ ভিত্তির ওপর স্থাপিত স্তম্ভটি সবচেয়ে কম উচ্চতার। প্রাচীরগুলি মাঝখানে একটি ভাঁজ দ্বারা কোণাকৃতির এবং একটির পর একটি সারিবদ্ধভাবে বসানো। কাঠামোটির সর্বোচ্চ বিন্দু বা শীর্ষ প্রায় ৪৬ মিটার উঁচু। কাঠামোটি এমনভাবে বিন্যস্ত যে, ভিন্ন ভিন্ন কোণ থেকে একে ভিন্ন ভিন্ন অবকাঠামোয় পরিদৃষ্ট হয়।

স্থপতি মূল স্তম্ভটি নির্মাণে সিমেন্ট-পাথরের কংক্রিট ব্যবহার করলেও এর সংলগ্ন অন্যান্য অবকাঠোমো ও পেভমেন্ট নির্মাণে লাল ইট ব্যবহার করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের ব্যবহার মূল স্তম্ভটির গাম্ভীর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। সমগ্র কমপ্লেক্সটি ৮৪ একর জমি জুড়ে বিস্তৃত। একে ঘিরে আছে আরও প্রায় ২৫ একর সবুজ ভূমি। স্তম্ভটির সামনে বেশ কয়েকটি গণকবর ও একটি প্রতিফলন সৃষ্টিকারী জলাশয় নির্মিত হয়েছে। প্রধান প্রবেশপথ দিয়ে প্রবেশ করলে স্তম্ভটিকে প্রবেশদ্বারের অক্ষবরাবরই চোখে পড়ে। কিন্তু মূল বেদীতে পৌছতে হলে বেশ কিছু উঁচু নিচু এবং একটি কৃত্রিম লেকের উপর নির্মিত সেতু পার হতে হয়। এ সব কিছুই স্বাধীনতার দীর্ঘ সংগ্রামকে চিহ্নিত করছে।

বলধা গার্ডেন

প্রচার তারিখ : ০৯/১০/২০১৮ খ্রিঃ
প্র সময় :
উপস্থাপনা :

ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পর্বে আজকের বিষয়: বলধা গার্ডেন

বলধা গার্ডেন ঢাকা শহরের ওয়ারী এলাকায় অবস্থিত একটি বোটানিক্যাল গার্ডেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাংলার এ অঞ্চলের এটি অন্যতম প্রাচীন উদ্যান। ভাওয়াল জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ১৯০৯ সালে বাগানটি প্রতিষ্ঠা করেন। বাগানের দুটি অংশ বৃহত্তর সিবিলি ও ক্ষুদ্রতর সাইকি । প্রথমটি গ্রীকদেবীর নাম অনুযায়ী, আর দ্বিতীয়টির অর্থ 'মানস' ।

নরেন্দ্র নারায়ণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে দুর্লভ প্রজাতির গাছপালা এনে বাগানটি ক্রমাগত সমৃদ্ধ করেছেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর বাগানের উন্নয়ন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থা কিছুকাল চলার পর ১৯৬২ সালে এটি সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কাছে হস্তান্তরিত হয় এবং বন বিভাগের ওপর সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বর্তায়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বন বিভাগ নব-উদ্যোগে উদ্যানের উন্নয়ন শুরু করে, ফলে বাগানের হারানো গৌরব অনেকটা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। দুটি নতুন গ্রীনহাউস নির্মাণসহ সর্বসাধারণের জন্য বাগানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাও গড়ে ওঠে এই সময়ে।

উদ্যানের উদ্ভিদসম্ভার প্রধানত সাত ধরনের অর্কিড, ক্যাকটাস, গ্রীনহাউসের গাছপালা, জলজ উদ্ভিদ, গোলাপ, শিলালগ্ন প্রজাতি ও দেয়ালের লতা, বৃক্ষশালা ও বিবিধ গাছগাছালি। সব মিলিয়ে এখানে আছে ৬৭২ প্রজাতির প্রায় ১৫,০০০টি নমুনা। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাগানটি পরিদর্শনে এসেছিলেন এবং জাপান থেকে সংগৃহীত ক্যামেলিয়া ফুলের অপূর্ব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর বিখ্যাত 'ক্যামেলিয়া' কবিতাটি রচনা করেন।

সিবিলি অংশের বৃহৎ সূর্যঘড়ি রৌদ্রোজ্জল দিনে সঠিক সময় নির্দেশ করে এবং কিশোরদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি প্রদর্শন দ্রব্য হয়ে আছে। বাগানের ফুলের শোভা দেখার জন্য আছে 'আনন্দভবন' নামের একটি বিশ্রামঘর । পরিবেশ প্রেমী দর্শকদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থান।

বাহাদুর শাহ পার্ক

প্রচারতারিখ : ১০/১০/২০১৮ খ্রিঃ
প্রসময় :
উপস্থাপনা :

ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পর্বে আজকের বিষয়: বাহাদুর শাহ পার্ক

বাহাদুরশাহ পার্ক বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার পুরানো ঢাকা এলাকার সদরঘাটের সন্নিকটে লক্ষ্মীবাজারে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান । এ স্থান বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। আঠারশতকের শেষের দিকে এখানে ঢাকার আর্মেনীয়দের বিলিযয়ার্ড ক্লাব ছিল। যাকে স্থানীয়রা নাম দিয়েছিল আন্টাঘর। বিলিয়ার্ড বলকে স্থানীয়রা আন্টা নামে অভিহিত করত। সেখান থেকেই এসেছে "আন্টাঘর" কথাটি। ক্লাবঘরের সাথেই ছিল একটি মাঠ বা ময়দান যা আন্টাঘর ময়দান নামে পরিচিত ছিল। ১৮৫৮ সালে রানী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করার পর এই ময়দানেই এ সংক্রান্ত একটি ঘোষণা পাঠ করে শোনান ঢাকা বিভাগের কমিশনার। সেই থেকে এই স্থানের নামকরণ হয় "ভিক্টোরিয়াপার্ক"।

১৯৫৭ সালের আগে পর্যন্ত পার্কটি ভিক্টোরিয়া পার্ক নামে পরিচিত ছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পর একপ্র হসনমূলক বিচারে ইংরেজ শাসকেরা ফাঁসি দেয় অসংখ্য বিপ্লবী সিপাহিকে। তারপর জনগণকে ভয় দেখাতে সিপাহিদের লাশ এনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এই ময়দানের বিভিন্ন গাছের ডালে। সিপাহী বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইংরেজ শাসনের সমাপ্তি ঘটিয়ে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ এর শাসন পুনরায় আনার জন্য। তাই তাঁর নামানুসারে এর নতুন নামকরণ করা হয় "বাহাদুরশাহ পার্ক"।

ঢাকার অন্যতম প্রধান নৌবন্দর সদরঘাট এলাকায় ঢুকতেই লক্ষ্মীবাজারের ঠিক মাথায় পার্কটি অবস্থিত। পার্কটিকে ঘিরে ৭টি রাস্তা একত্রিত হয়েছে। এর চারপাশে সরকারী গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসহ বেশকিছু স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থাকার কারণে এটি পুরনো ঢাকার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে বিবেচিত। পার্কের উত্তরপাশেই অবস্থিত ঢাকার প্রথম পানি সরবরাহ করার জন্য তৈরি ট্যাংক। উত্তর-পূর্বকোনে আছে কবি নজরুল সরকারি কলেজ, পূর্ব পাশে রয়েছে ঢাকার অন্যতম প্রাচীন বিদ্যালয় সরকারী মুসলিম স্কুল, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। পার্কের ঠিক উত্তরপশ্চিম পাশেই রয়েছে ঢাকার জজকোর্ট। এছাড়া বাংলাবাজার, ইসলামপুর, শাখারী বাজারের মত ঢাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু এলাকা থেকে বর্তমান ঢাকার নতুন এলাকায় আসতে এ পার্ক এলাকার রাস্তাটিই প্রধান সড়ক।

ঢাকা কলেজ

প্রচার তারিখ : ১১/১০/২০১৮ খ্রিঃ
প্র সময় :
উপস্থাপনা :

ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পর্বে আজকের বিষয়: ঢাকা কলেজ

ঢাকা কলেজ বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৮৩৫ সালের ১৫ জুলাই 'ঢাকা গভর্নমেন্ট স্কুল' নামে এটি যাত্রা শুরু করে। এর মাধ্যমে ঢাকাতেই বাংলার প্রথম সরকারি ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়। স্কুলের জন্য সদরঘাটের কাছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পুরানো দোতলা বাণিজ্য কুঠিটি ভাড়া নেওয়া হয়।

ঢাকা গভর্নমেন্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা ঢাকা শহরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে এক নবযুগের সূচনা করে। এ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের আধুনিক কলা বিদ্যা, বিজ্ঞান এবং দর্শনের সঙ্গে এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের প্রথম পরিচয় ঘটে। এই নতুন শিক্ষার আলোকে শিক্ষার্থীরা দেশ ও সমাজকে নবরূপে গড়তে প্রয়াসী হয়।

১৮৩৮-৩৯ শিক্ষা বর্ষে ঢাকা গভর্নমেন্ট স্কুলে ৮টি ক্লাস ছিলো এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৪০। শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন ৭ জন ইংরেজ এবং ৪ জন বাঙালি । ১৮৪১ সালে স্কুলটি কলেজের মর্যাদায় উন্নীত হয় এবং এর নাম হয় 'ঢাকা সেন্ট্রাল কলেজ'। ১৮৪১ সালের ২০ নভেম্বর কলকাতার বিশপ রেভারেন্ড ড্যানিয়েল সদরঘাটে কলেজের মূল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ভবনটির নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৮৪৪ সালে। ১৮৭৩ সালে স্থান সঙ্কুলানের অভাবে ভিক্টোরিয়া পার্কের পূর্বে একটি প্রশস্ত দালানে কলেজটি সরিয়ে নেওয়া হয়। সেখান থেকে আবার ১৯০৮ সালে বর্তমান কার্জন হলে স্থানান্তরিত করা হয়।

১৯২০ সালের জুলাই মাস থেকে ঢাকা কলেজের ইন্টার মিডিয়েট অর্থাৎ বর্তমানের এইচএসসি ক্লাসকে কলেজের বি.এ, বি.এস.সি এবং এম.এ, এম.এস.সি ক্লাস থেকে পৃথক করে নতুন একটি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ গঠন করা হয়। এই নবগঠিত ইন্টারমিডিয়েট কলেজকে ২০ আগস্ট কার্জন হল থেকে সরিয়ে তদানীন্তন ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৫ সালে কলেজটি বর্তমান জায়গায় নিউমার্কেটের পাশে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে কলেজটি ১৮ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত।

বড় কাটরা, ঢাকা

প্রচার তারিখ : ১২/১০/২০১৮ খ্রিঃ
প্র সময় :
উপস্থাপনা :

ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পর্বে আজকের বিষয়: **বড় কাটরা, ঢাকা।**

মুগল রাজধানী ঢাকার চক বাজারের দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে বড় কাটরা নামক স্থাপনাটি অবস্থিত। মধ্য এশিয়ার ক্যারাভান সরাই-এর ঐতিহ্য অনুসরণে নির্মিত বড় কাটরায় মুগল রাজকীয় স্থাপত্য-রীতির সকল বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি বিদ্যমান।

বড় কাটরায় দুটি শিলালিপি আছে। এর একটিতে উৎকীর্ণ আছে যে, ইমারতটি ১৬৪৩-৪৪ খ্রি নির্মিত এবং অন্যটিতে আছে ১৬৪৫-৪৬ খ্রি নির্মিত। প্রচলিত আছে যে, বাংলার সুবেদার শাহ সুজা এ ভবনটি কাটরা বা দফতর হিসেবে ব্যবহারের জন্য গড়ে তোলেন।

আয়তাকারে নির্মিত এ অট্টালিকার তিনতলা বিশিষ্ট সদর তোরণ ছিল অতি মনোমুগ্ধকর এবং এটি দক্ষিণ দিকে এবং পূর্ব-পশ্চিম দিকে প্রসারিত ছিল। স্থাপনাটিতে প্রবেশের চারটি পথ রয়েছে। চারটি প্রবেশ পথের পরেই ছিল অষ্টকোণাকৃতির একটি হল কামরা এবং এর উপরের ছাদ ছিল গম্বুজাকৃতির এবং তাতে নানা রকম লতাপাতা ইত্যাদির সুন্দর অলঙ্করণ ছিল। এ হল কামরার ভেতর দিকে দোতলা ও তিনতলায় ওঠার সিঁড়ি আছে এবং এই দোতলায় এবং তিনতলায় নির্মিত ছিল বসবাসের কক্ষ। শুধু প্রবেশপথের উপরের অংশই ছিল তিনতলা বিশিষ্ট। কাটরার বাকি অংশ ছিল দ্বিতল। বড় কাটরার দক্ষিণ ব্লকের দুকোণে দুটি বিরাট টাওয়ার রয়েছে।

সময়ের প্রবাহে ভবনটিকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় নি। তবে তা সত্ত্বেও বড় কাটরা ইমারতটি বাংলায় মুগল স্থাপত্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

ঢাকা চিড়িয়াখানা

প্রচার তারিখ : ১৪/১০/২০১৮ খ্রিঃ
প্র সময় :
উপস্থাপনা :

ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পর্বে আজকের বিষয়: ঢাকা চিড়িয়াখানা।

ঢাকা চিড়িয়াখানা ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় চিড়িয়াখানা। ১৯৫০ সালে হাইকোর্ট চত্বরে জীবজন্তুর প্রদর্শনশালা হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৪ সালে ঢাকা চিড়িয়াখানা নামে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। পরে জায়গা স্বল্পতার কারণে ১৯৭৪ সালের ২৩ জুন এটি বর্তমান জায়গায় ঢাকার মিরপুর -২ এ স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে চিড়িয়াখানাটি প্রায় ২১৩ একর জমির উপর অবস্থিত। এটি মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাধানে পরিচালিত। প্রতিদিন এখানে প্রচুর দর্শনার্থী আসেন এবং দিন দিন এই সংখ্যা বাড়ছে।

এখানকার প্রাণির প্রজনন কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে বাঘ, সিংহ, চিতা, নানা জাতের বানর ও অনেক প্রজাতির পাখির প্রজননে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চিড়িয়াখানার সঙ্গে প্রাণি বিনিময়ের ব্যবস্থাও আছে। এখানে রয়েছে দুটি স্বচ্ছ পানির লেক যেখানে প্রতি বছর শীতে অসংখ্য পরিযায়ী জলজ পাখি ভিড় জমায়।

প্রতি বছর প্রায় ৩০ লক্ষ লোক চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করে। সরকারি ছুটির দিনগুলিতেও চিড়িয়াখানা দর্শনার্থীদের জন্য খোলা রাখা হয়। চিড়িয়াখানার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনার্থী বিশেষ করে শিক্ষার্থী এবং শিশুদের জন্য সব ধরনের বিনোদন সুবিধা দেয়। প্রবশপথেই আছে একটি তথ্যকেন্দ্র, যেখান থেকে দর্শনার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারে। বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য হুইল চেয়ারেরও ব্যবস্থা আছে। এর ভিতর বাগানে একটি জ্যুওলিজক্যাল মিউজিয়াম আছে।

বর্তমানে ঢাকা চিড়িয়াখানায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি ও এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি অনুষদ, বিভিন্ন ভেটেরিনারি কলেজ থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইন্টারনশিপ কার্যক্রম চালু রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রাণিবিদ্যা বিষয়ক উচ্চ শিক্ষার জন্যও ঢাকা চিড়িয়াখানায় আসা যাওয়া করেন।

জাতীয় সংসদ ভবন

প্রচার তারিখ : ১৫/১০/২০১৮ খ্রিঃ
প্রচার সময় :
উপস্থাপনা :

ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পর্বে আজকের বিষয়: **জাতীয় সংসদ ভবন।**

জাতীয় সংসদ ভবন রাজধানী ঢাকার শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত। বলা যায়, এটি আধুনিক যুগের স্থাপত্য রীতির সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন এবং এর মাধ্যমে সূচিত হয় আধুনিকোত্তর যুগের স্থাপত্য রীতি। এ অসাধারণ ভবনটি আমেরিকার স্থাপতি লুই আই কান-এর সৃষ্টিশীল ও কাব্যিক প্রকাশের নিদর্শন।

১৯৫৯ সালে তৎকালীন সরকার পাকিস্তানের প্রস্তাবিত দ্বিতীয় রাজধানী শেরে বাংলা নগরে দ্বিতীয় সংসদ ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। খ্যাতনামা স্থাপতি লুই কান সংসদ ভবন কমপ্লেক্সটির নকশা প্রণয়নের জন্য নির্বাচিত হন। ১৯৬১ সালে বর্তমান মানিক মিয়া এভিনিউ-এর উত্তর পার্শ্বে ২০৮ একর জমি দ্বিতীয় রাজধানী প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা হয় এবং ১৯৬৪ সালে কমপ্লেক্সটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৯৮২ সালে ভবনটির নির্মাণ কাজ শেষ হয় ।

কমপ্লেক্সটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে মূল সংসদ ভবন, সংসদ সদস্য, মন্ত্রী ও সেক্রেটারিদের জন্য হোস্টেল, অতিথি ভবন ও কমিউনিটি বিল্ডিং। একটি কৃত্রিম লেক ভবনের চার পাশের প্রাচীর ঘিরে আছে। সমস্ত ভবনটাকে মনে হয় যেন পানির উপরে ভেসে উঠেছে। পার্লামেন্ট ভবনে প্রবেশের জন্য রয়েছে দক্ষিণের গ্র্যান্ড প্লাজা ও উত্তরে সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত বাগান ও ইউক্যালিপটাসের সারি শোভিত প্রেসিডেন্সিয়াল স্কয়ার। বাইরের দিকে গতাণুগতিকভাবে জানালা স্থাপন পদ্ধতি ভবনটিতে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এবং স্থাপত্যিক শৈলীতে ভবনটি ঢাকার আধুনিক ভবনসমূহ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ভবনটির উত্তর প্রবেশ পথের দিকে রয়েছে একটি এ্যাম্পি থিয়েটার যেখানে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বৃত্তাকার ও আয়তাকার কংক্রিটের সমাহার ভবনটিকে দিয়েছে এক বিশেষ স্থাপত্যিক সৌকর্য যা এর মহান উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভবনের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে হলো সংসদের প্রধান হল, যেখানে সংসদ সদস্যগণ অধিবেশনে বসেন।

হোসেনী দালান

প্রচার তারিখ : ১৬/১০/২০১৮ খ্রিঃ
প্রচার সময় :
উপস্থাপনা :

ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পর্বে আজকের বিষয়: **হোসেনী দালান**

হোসেনি দালান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের পুরানো ঢাকা এলাকায় অবস্থিত শিয়া সম্প্রদায়ের একটি ইমারত। এটি মুগল আমলে নির্মিত হয়েছিল মর্মে ধারণা করা হয়। ১০ই মুহররম ৬১ হিজরি বা ১০ই অক্টোবর ৬৮০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ ইরাকের কারবালার যুদ্ধে আল-হোসেন শহীদ হন। সেই সময়ে শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত একটি সাধারণ রীতি ছিল আল-হোসেন স্মরণে ইমারত নির্মাণ করা। বাংলার সুবেদার শাহ সুজার শাসনকালে এই ইমারত প্রথম নির্মাণ করা হয়।

শাহ সুজা নিজে সুন্নি মুসলমান হলেও শিয়াদের মধ্যে প্রচলিত রীতিনীতির পৃষ্ঠপোষকতা করতে আগ্রহী ছিলেন। প্রচলিত লোক কাহিনী অনুসারে, জনৈক সৈয়দ মুরাদ একদা স্বপ্নে আল হোসেনকে একটি 'তাজিয়াখানা' নির্মাণ করতে দেখে এই ইমারত নির্মাণে উৎসাহিত হন। সৈয়দ মুরাদ এই ইমারতের নাম রাখেন হোসেনী দালান। পরবর্তীকালে ১৮০৭ ও ১৮১০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্যোগে ইমারতটির সংস্কার করা হয় এবং ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের পর এর কিছু অংশ নতুন করে পুনর্নির্মাণ করা হয়। সংস্কার ও সম্প্রসারণের ফলেই এটি বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। এই হোসেনী দালান একটি উঁচু মঞ্চের উপর স্থাপিত। পূর্বদিকের একটি সিঁড়ির সাহায্যে এই মঞ্চে উঠতে হয়। মূল ইমারতটি পাশাপাশি সংস্থাপিত দুটি হলকক্ষ নিয়ে গঠিত।

সামগ্রিকভাবে ইমারতটিকে দেখতে একটি আধুনিক ইমারত বলেই মনে হয়, তবে এর কোথাও কোথাও পুরানো আমলের স্থাপত্যের চিহ্ন দেখা যায়। মুহররমের ১ থেকে ১০ তারিখ হোসেনী দালান ঢাকা শহরের মূল আকর্ষণে পরিণত হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানে সমবেত হয়ে 'হায় হোসেন, হায় হোসেন' বলে মাতম করতে থাকে। আশুরার দিনে (অর্থাৎ ১০ই মুহররম) এখান থেকে বিশাল একটি তাজিয়া মিছিল বের হয় এবং তা ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলি প্রদক্ষিণ করে নগরীর পশ্চিম প্রান্তে প্রতীকীভাবে কারবালা নাম দেওয়া একটি স্থানে গিয়ে তা শেষ হয়।

জিনজিরা প্রাসাদ

প্রচার তারিখ : ১৭/১০/২০১৮ খ্রিঃ
প্রচার সময় :
উপস্থাপনা :

ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পর্বে আজকের বিষয়: জিনজিরা প্রাসাদ

জিনজিরা প্রাসাদ ঢাকার বড় কাটরা প্রাসাদ-দুর্গের প্রায় দক্ষিণ বরাবর বুড়িগঙ্গা নদীর অপর তীরে অবস্থিত। বাংলার মুগল সুবাহদার দ্বিতীয় ইবরাহিম খান তাঁর প্রমোদকেন্দ্র হিসেবে প্রাসাদটি নির্মাণ করেন। পারিপার্শ্বিক এলাকাসহ প্রাসাদস্থলটি তখন ছিল চতুষ্পার্শ্বে নদীবেষ্টিত একটি দ্বীপের মতো। এ কারণেই ওই স্থানে নির্মিত প্রাসাদটির নামকরণ হয় দ্বীপের প্রাসাদ বা জিনজিরা প্রাসাদ । প্রাসাদটি নদীর তীর ঘেষে নির্মিত হয়েছিল, এবং নদীর ওপর একটি কাঠের সেতু দ্বারা বড় কাটরার নিকটে ঢাকা নগরীর সঙ্গে প্রাসাদটির সংযোগ স্থাপিত ছিল।

জিনজিরা প্রাসাদে ছিল মূল প্রাসাদ ভবন, আয়তাকার সুবিস্তৃত দ্বিতল স্নানাগার, দক্ষিণের সদরে প্রহরী-কক্ষ সহ দ্বিতল প্রবেশ-ফটক । প্রাসাদের বহিঃদেয়ালের সুপ্রশস্ত ভিত এবং সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসহ চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিখা এর প্রাসাদ-দুর্গের বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিতবহ।

বাংলার দীউয়ানি লাভের পর মুর্শিদকুলী খান এ প্রাসাদে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর রাজস্ব প্রশাসন দপ্তর ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে মকসুদাবাদে স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত প্রাসাদটি ছিল তাঁর আবাসস্থল । এর পরেও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ঢাকা সফরকালে তিনি এ প্রাসাদেই অবস্থান করতেন। নবাব আলীবর্দী খানের অধীনে ঢাকার নায়েব নাযিম নওয়াজিশ মুহাম্মদ খানের প্রতিনিধি হোসেন কুলি খানের পারিবারিক আবাসস্থল ছিল এ প্রাসাদ।

প্রাসাদটি এখন নিশ্চিহ্ন প্রায়। প্রাসাদস্থলটি এখন স্থানীয় লোকদের নিকট হাওলি (হাভেলি'র অপভ্রংশ) নামে পরিচিত। বর্তমানে এর চারপাশে গড়ে উঠেছে ঘিঞ্জি বসতি ও বাণিজ্যিক স্থাপনা।

জগন্নাথ কলেজ

প্রচার তারিখ : ১৮/১০/২০১৮ খ্রিঃ
প্রচার সময় :
উপস্থাপনা :

ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পর্বে আজকের বিষয়: জগন্নাথ কলেজ

জগন্নাথ কলেজ বাংলাদেশের একটি অন্যতম পুরনো ও প্রখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মানিকগঞ্জ জেলার বালিয়াটির জমিদার কিশোরীলাল চৌধুরী ১৮৬৮ সালে তাঁর পিতার নামে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন জগন্নাথ স্কুল। ১৮৮৪ সালের ৪ জুলাই জগন্নাথ স্কুলটি জগন্নাথ কলেজে উন্নীত হয়। ১৯০৭ সালের ১লা মার্চ একটি দলিলের মাধ্যমে ট্রাস্টি বোর্ডের হাতে কলেজের ভার অর্পণ করা হয়। ১৯১০ সালে এই কলেজে আই.এ, আই.এস.সি ও বি.এ (পাস) ছাড়াও ইংরেজি, দর্শন ও সংস্কৃত বিষয়ে অনার্স এবং ইংরেজিতে এম.এ পড়ানো হতো।

১৯১৯ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা স্বীকার করে। কেননা সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে জগন্নাথ কলেজ ও ঢাকা কলেজ থেকে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার সুযোগ ছিল। ১৯২০ সালে Jagannath College Act এর মাধ্যমে জগন্নাথ কলেজ ট্রাস্ট ভেঙ্গে দিয়ে কলেজ ও এর সম্পত্তি বাংলার গভর্নরের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

১৯২১ সালের ১লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত জগন্নাথ কলেজ ও ঢাকা কলেজের ডিগ্রি ক্লাসের ছাত্রদের নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ক্লাস শুরু হয়। তখন জগন্নাথ কলেজের ৩য় ও ৪র্থ বর্ষে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩০৩। জগন্নাথ কলেজের এসব ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হলে জগন্নাথ কলেজ ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পরিণত হয়। কলেজের নতুন নাম হয় 'জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ'।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সহযোগিতা দানের সম্মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি হলের নামকরণ করা হয় : জগন্নাথ হল ও ঢাকা হল। ঢাকা হল বর্তমানে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল নামে পরিচিত। ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত দু'টি হলের পুনর্মিলনী উৎসব পালিত হতো জগন্নাথ কলেজ ও ঢাকা কলেজের ছাত্র সহযোগে। এই দুই কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে কেবল ছাত্র নয়, এমনকি শিক্ষক এবং লাইব্রেরির বই দিয়েও সহযোগিতা করেছিল। উল্লেখ্য, প্রাথমিক স্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার গঠিত হয়েছিল এই দুই কলেজের গ্রন্থাদি দিয়ে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে কলেজে অনার্স কোর্স ও পরে মাস্টার্স কোর্স খোলা হলে ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৯৮২ সালে কলেজের ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস তুলে দেওয়া হয়।

২০০৫ সালে জাতীয় সংসদে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়। ফলে জগন্নাথ কলেজ বাংলাদেশের অন্যতম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। ২০০৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজির প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম খান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে যোগদান করেন।

পানাম নগর

প্রচার তারিখ : ১৯/১০/২০১৮ খ্রিঃ
প্রচার সময় :
উপস্থাপনা :

ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পর্বে আজকের বিষয়: পানাম নগর

পানাম নগর সোনারগাঁয়ের একটি প্রাচীন এলাকা। বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার অন্তর্গত এই এলাকা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মোগরাপাড়া ক্রসিং থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে মুগলদের সোনারগাঁও অধিকারের পর মহাসড়ক ও সেতু নির্মাণ করে রাজধানী ঢাকা শহরের সঙ্গে পানাম এলাকার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পানামে এখনও মুগল আমলের তিনটি ইটনির্মিত সেতু রয়েছে। এগুলি হলো পানাম সেতু, দালালপুর পুল ও পানামনগর সেতু। এ সেতুগুলির অবস্থান এবং পানামের তিন দিকের খাল বেষ্টনী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এলাকাটি মধ্যযুগীয় নগরের উপশহর ছিল।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এর ফলশ্রুতিতেই গড়ে উঠেছিল বর্তমান পানামনগর। উপনিবেশিক আমলে সোনারগাঁও সুতিবস্ত্রের প্রধানত ইংলিশ থান কাপড়ের ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং এরই সুবাদে গড়ে ওঠে নতুন শহর পানামনগর।

উনিশ শতকে ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে উঠে আসা কিছুসংখ্যক হিন্দু ব্যবসায়ী স্থানটিকে আবাসস্থলরূপে বেছে নেন। পানাম নগরের ইমারতগুলি উনিশ শতকের প্রথম দিকে, এবং পরেরগুলি উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলে ধরে নেওয় হয়। উনিশ শতক থেকে গড়ে ওঠা পানামনগরের নির্মাণ অগ্রগতি ও শ্রীবৃদ্ধি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

পানামনগর একটি একক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত শহর। গড়ে ৫ মিটার প্রশস্ত ও ৬০০ মিটার দীর্ঘ একটিমাত্র সড়কের দুপাশ ঘিরে গড়ে উঠেছে শহরটি। ইমারতগুলি সড়কের দুপাশে সারিবদ্ধভাবে নির্মিত এবং শহর এলাকার বাড়ির অনুরূপ বৈশিষ্ট্যে সবগুলি ইমারতের সদর বা সম্মুখভাগ রাস্তার দিকে। এ ইমারতসমূহ পানাম বাজার পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে রয়েছে ভগ্নপ্রায় ও অযত্নে লালিত ৫২টি বাড়ি; সড়কের উত্তর পাশে ৩১টি এবং দক্ষিণ পার্শ্বে ২১টি। গৌরবময় সময়ে পানাম নগরের চতুষ্পার্শ্ব কৃত্রিম খাল বা পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

সোনারগাঁও

প্রচার তারিখ : ২০/১০/২০১৮ খ্রিঃ
প্রচার সময় :
উপস্থাপনা :

ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পর্বে আজকের বিষয়: সোনারগাঁও

সোনারগাঁও স্বর্ণগ্রাম বা সুবর্ণগ্রাম নামে অভিহিত বঙ্গের এক প্রাচীন জনপদ। প্রাচীন সুবর্ণগ্রাম জনপদ পূর্বে মেঘনা, দক্ষিণে ধলেশ্বরী এবং পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা নদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং এর উত্তর সীমা বিস্তৃত ছিল আধুনিক বৃহত্তর ঢাকা জেলার উত্তর প্রান্তসীমায় ব্রহ্মপুত্র নদী পর্যন্ত।

ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ কর্তৃক ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাংলার প্রথম স্বাধীন মুসলিম সালতানাতের রাজধানী ছিল সোনারগাঁও, আর তখন থেকেই শুরু হয় সোনারগাঁয়ের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের। ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে লখনৌতির সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের হাতে ফখরুদ্দীনের রাজবংশের পতনের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ চৌদ্দ বছর সোনারগাঁও সমগ্র পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণপূর্ব বঙ্গের সুলতানি শাসনের রাজধানীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। ঈসা খান মসনদ-ই-আলা প্রতিষ্ঠিত ভাটি রাজ্যের রাজধানী ছিল সোনারগাঁয়।

ঢাকায় মুগল রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সোনারগাঁও নগরীর দ্রুত অবক্ষয় ঘটে। ইবনে বতুতা ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁওকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর-নগরী রূপে বর্ণনা করেন। ইতিহাসখ্যাত সোনারগাঁও নগর এখন শুধু নামেই রয়েছে। ঢাকা নগরীর প্রতিষ্ঠার পর থেকে সোনারগাঁও তার প্রাধান্য হারাতে থাকে এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে সোনারগাঁও পরিণত হয় ‘গভীর জঙ্গলে আচ্ছাদিত গন্ড গ্রামে’। বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য রক্ষার্থে লোক ও কারুশিল্প ফাইন্ডেশনের উদ্যোগে এখানে গড়ে তোলা হয়েছে শিল্পাচার্য জয়নুল লোকশিল্প জাদুঘর।

রমনা রেসকোর্স

প্রচার তারিখ : ২২/১০/২০১৮ খ্রিঃ
প্রচার সময় :
উপস্থাপনা :

ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পর্বে আজকের বিষয়: রমনা রেসকোর্স

বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নামে পরিচিত রমনা রেসকোর্স মহানগরী ঢাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। রমনা রেসকোর্সের দক্ষিণে পুরানো হাইকোর্ট ভবন, তিন জাতীয় নেতার সমাধি; পশ্চিমে বাংলা একাডেমী, চারুকলা ইনস্টিটিউট; উত্তরে বারডেম হাসপাতাল, ঢাকা ক্লাব এবং পূর্বে সুপ্রীম কোর্ট ভবন ও রমনা পার্ক।

রমনার ইতিহাস শুরু হয় ইংরেজি ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে যখন মুগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে সুবাহদার ইসলাম খান ঢাকা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এই এলাকায় তখন উন্নত বসতবাড়ি ছাড়াও মসজিদ, বাগান, সমাধিসৌধ, মন্দির ইত্যাদি গড়ে ওঠে। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ব্রিটিশ কালেক্টর মি. ডয়েস এ এলাকার বেশির ভাগ পুরানো স্থাপনা সরিয়ে ফেলেন এবং জঙ্গল পরিষ্কার করে রমনাকে একটি পরিচ্ছন্ন এলাকার রূপ দেন।

নাজির হোসেন কিংবদন্তির ঢাকা গ্রন্থে লিখেছেন, “ব্রিটিশ আমলে রমনা ময়দানটি ঘোড়দৌড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। প্রতি শনিবার হতো ঘোড়দৌড়। এটা ছিল একই সঙ্গে ব্রিটিশ শাসক ও সর্বস্তরের মানুষের চিত্তবিনোদনের একটি স্থান।” ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের শাসনামলে বঙ্গভঙ্গের সময় পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে নবগঠিত প্রদেশের গভর্নরের সরকারি বাসভবন গভর্নমেন্ট হাউজ এখানেই নির্মান করা হয়। বর্তমানে এই ভবন পুরাতন হাইকোর্ট ভবনে নামে পরিচিত। বৃহত্তর রমনা এলাকায় ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে এলাকাটির গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে মুক্তি পেলে রমনা রেসকোর্সে তাঁকে এক নাগরিক সংবর্ধনায় বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এই রমনাতে এক মহাসমাবেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্যগণ আনুষ্ঠানিকভাবে এই রমনা মাঠেই আত্মসমর্পণ করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর জাতীয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নামানুসারে রমনা রেসকোর্স ময়দানের নাম পরিবর্তন করে "সোহরাওয়ার্দী উদ্যান" রাখা হয়।

বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ

প্রচার তারিখ : ২৩/১০/২০১৮ খ্রিঃ
প্রচার সময় :
উপস্থাপনা :

ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পর্বে আজকের বিষয়: বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ

বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ ঢাকার রায়ের বাজারে নির্মিত। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি লগ্নে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের সহযোগীদের সহায়তায় আমাদের দেশের অসংখ্য বুদ্ধিজীবীসহ আরও অজস্র মানুষকে হত্যা করেছিল। এই সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ স্মৃতিসৌধটি এখানে নির্মাণ করা হয়। মূলত, যে স্থানটিতে এই নারকীয় হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিল সেখানেই এই সৌধটি নির্মিত হয়েছে। নিহত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, সাংবাদিক, লেখক, চলচ্চিত্র পরিচালক ও অন্যান্য পেশাজীবী।

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার এ নৃশংস হত্যাকান্ড সংঘটিত হওয়ার স্থানে স্মৃতিসৌধটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেকটস্ যৌথভাবে স্মৃতিসৌধের নকশা প্রণয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা আহবান করে। ২২টি নকশার মধ্যে স্থপতি ফরিদউদ্দীন আহমেদ ও স্থপতি জামি-আল-শফি প্রণীত নকশাটি নির্বাচিত হয়। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে সৌধটির নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়।

সমগ্র সৌধটি সাড়ে তিন একর জমির উপর অবস্থিত। স্মৃতিসৌধের প্রধান অংশটি প্রায় ১৭ মি উঁচু, ১ মিটার পুরু ও ১১৫ মি দীর্ঘ একটি ইটের তৈরি বাঁকানো দেয়াল। এটি রায়ের বাজারের আদি ইটখোলার প্রতীক, যেখানে বুদ্ধিজীবীদের মৃতদেহগুলি পড়েছিল। দেয়ালটির দুদিক ভাঙা । এ ভগ্ন দেয়াল ঘটনার দুঃখ ও শোকের গভীরতা নির্দেশ করছে। বাঁকা দেয়ালের সম্মুখভাগে একটি স্থির জলাধার আছে। জলাধারের ভেতর থেকে কালো গ্র্যানাইট পাথরের একটি স্তম্ভ উঠে এসেছে। এটি শোকের প্রতীক। বাঁকানো দেয়ালের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে একটি প্রায় ৬ মিটার বর্গাকার জানালা আছে। এ জানালা দিয়ে পেছনের আকাশ দেখা যায়।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

প্রচার তারিখ : ২৪/১০/২০১৮ খ্রিঃ
প্রচার সময় :
উপস্থাপনা :

ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পর্বে আজকের বিষয়: মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধ ও আত্মত্যাগের প্রতীক। প্রায় ২০ একর জমির উপর স্মৃতিসৌধটি স্থাপিত। ২৩টি কংক্রিটের ত্রিকোণাকার স্তম্ভ সমন্বয়ে এ স্মৃতিসৌধ নির্মিত। স্থপতি তানভীর কবিরের নকশায় এ সৌধটিকে উদীয়মান সূর্যের প্রতীক বলে মনে হয়। ২৩টি স্তম্ভ পাকিস্তানের ২৩ বছর শাসনের প্রতীক। এই ২৩ বছরে বাঙালি জাতি ধীরে ধীরে যে সংগ্রাম গড়ে তোলে এবং এর প্রতীকও এই ২৩টি স্তম্ভ।

৩ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতায় ১৬০ ফুট ব্যাসে স্মৃতিসৌধের বেদীটি নির্মিত। বেদীর অর্ধাংশে স্তম্ভগুলো সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান। সমকোণী ত্রিভুজাকৃতির এ স্তম্ভগুলোর প্রথমটির উচ্চতা ৯ ফুট এবং এর দৈর্ঘ্য ২০ ফুট। পরবর্তী প্রতিটি স্তম্ভ উচ্চতায় ১ ফুট এবং দৈর্ঘ্যে ৯ ইঞ্চি করে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩ তম স্তম্ভের উচ্চতা দাঁড়িয়েছে ২৫ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্যও হয়েছে ২৫ ফুট ৬ ইঞ্চি।

স্মৃতি সৌধটিতে মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণের স্থানটি লাল সিরামিকের ইট দ্বারা আয়তক্ষেত্র আকারে চিহ্নিত করা হয়েছে। বেদীতে আরোহণের সোপান নয়টি ধাপে বিভক্ত। সোপানের এ নয়টি ধাপ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতির প্রতীক।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে বৈদ্যনাথতলা গ্রামের নামকরণ হয় মুজিবনগর। মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণের স্থানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য পরবর্তী সময়ে এখানে নির্মিত হয়েছে এই স্মৃতিসৌধটি।